আরণ্যক – ষষ্ঠ অধ্যায়

সুকুমারী ভট্টাচার্য

আরণ্যক

সাধারণত প্রথাগতভাবে বৈদিক সাহিত্যকে দুটি প্রধানভাগে বিভক্ত করা হয়,–কর্মকাণ্ড (সংহিতা ও ব্রাহ্মণ) এবং জ্ঞানকাণ্ড (আরণ্যক ও উপনিষদ)। এই বর্গীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বেদের অন্য একটি সংজ্ঞাও স্মরণ করতে পারি : 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম', যেখানে বেদের দুটি ভাগ কল্পিত হয়েছে, মন্ত্র (বা সংহিতা) ও ব্রাহ্মণ। এই বিভাজনে আপাতদৃষ্টিতে আরণ্যক ও উপনিষদ উল্লেখিত হয় নি। দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই প্রচুর সত্য রয়েছে, তবে, দ্বিতীয় বর্গীকরণে বিষয়বস্তু অপেক্ষা আঙ্গিকের উপরেই যেন অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। কেননা, সংহিতা নিঃসংশয়ে একটি সাহিত্যমাধ্যম; পরবর্তী রচনাগুলির চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্যই তার নেই। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক কিংবা আরণ্যক ও উপনিষদ কিংবা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যে আমরা তেমন কোনো স্পষ্ট রচনাভঙ্গিগত ভেদরেখা কল্পনা করতে পারি না; মাঝে মাঝে এই তিন শ্রেণীর রচনা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত হয়ে পরস্পরের সীমা লঙ্ঘন করেছে। ফলে, মাধ্যমগত বিন্যাস অনুযায়ী আমাদের নিকট দুটি প্রধান ও স্পষ্ট শ্রেণী প্রকট হয়েছে-সংহিতা ও সংহিতাপরবর্তী সাহিত্য, যাতে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ ইচ্ছামতো সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে, শ্রেণীবিন্যাসের দ্বিতীয় রীতি অর্থাৎ সৎহিতা পরবর্তী সাহিত্যিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে দুটি ভিন্ন যুগ, অঞ্চল বা ধর্মীয় দর্শনের মূল প্রতিফলিত হয়েছে। জ্ঞানকাণ্ডের সমগ্র যুগ ধরে যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্রমাগত অবমূল্যায়নের ফলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যদিও প্রত্যেক সংহিতার এক বা একাধিক পৃথক ব্রাহ্মণ রয়েছে, তবু প্রত্যেক সংহিতার কিন্তু নিজস্ব আরণ্যক বা উপনিষদ নেই। কয়েকটি গ্রন্থ। ব্রাহ্মণ অংশেই সমাপ্ত,

আবার কয়েকটি গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটেছে আরণ্যকে। তেমনি কয়েকটি সংহিতার অব্যবহিত পরবর্তী অংশ হ'ল উপনিষদ, আবার কয়েকটিতে কোনো আরণ্যকই নেই। শুধুমাত্র তিনটি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ-সবই পাওয়া যাচ্ছে: ঋগ্বেদের ঐতরেয় ও কৌষীতকি এবং যজ্ববেদের তৈত্তিরীয়। সুতরাং যে শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী রচনার প্রধান এবং সর্বতোভাবে পরস্পর-নিরপেক্ষ দুটি মাধ্যম অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে নির্দেশ করা হয়েছে, তারই যুক্তিযুক্ততা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত। শেষোক্ত সাহিত্যরীতির তরল্যায়িত অবস্থা একটি গ্রন্থের যৌগিক নামকরণে ব্যক্তি হয়েছে : কৌষীতকি ব্রাহ্মাণোপণিষদ; লক্ষণীয় এই যে, এতে আরণ্যক উল্লেখিত হয় নি। তেমনি জৈমিনীয় উপনিষদ, ব্রাহ্মণেও আরণ্যকের উল্লেখ নেই; তাছাড়া 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি এখানে উপনিষদের পরে ব্যবহৃত হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটি বিচার করলে দেখা যায় যে, তালবকার শাখার আরণ্যকের বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এসব থেকে সেই স্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যখন লেখকেরা নতুন ধরনের সাহিত্যিক প্রবণতা সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু পৃথক মাধ্যমরূপে নতুন রচনাগুলি তখনও নির্দেশিত বা বগীকৃত হয় নি। আরণ্যক নামটি সম্ভবত শুধু রচনার স্থানগত তাৎপর্যই বহন করছে, অর্থাৎ অরণ্যভূমি যা বহু অনুপুঙ্খাযুক্ত সুদীর্ঘ যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত ছিল না; সেখানে অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ্যদের উপযুক্ত ন্যূনতম কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভবত হত, যার মধ্যে সম্ভবত ছিল অগ্নিহোত্র ও কিছু কিছু সরল গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান। এখানে যজ্ঞ থেকে উত্তীর্ণ ধর্মচারণ অর্থাৎ তত্ত্বান্বেষণের চর্চাই হত।

বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ গোল্ডস্টুকের আমাদের এই তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, শুধু অরণ্যে বসবাসকারী ব্যক্তি অর্থেই পাণিনি 'আরণ্যক' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। 'অরণ্যে রচিত গ্রন্থ' অর্থে 'আরণ্যক' শব্দের প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন কাত্যায়ন–আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে; সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ সময়ের কাছাকাছি আরণ্যক পৃথক প্রকাশ মাধ্যমরূপে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল। আঙ্গিক ও মূলভাবের বিচারে আরণ্যক ও উপনিষদকে যুগ পরিবর্তনের সাহিত্য বলে গণ্য করা যায়। আরণ্যকের প্রবণতা অরণ্যভূমির অধিবাসীদের জ্ঞান ও সন্ন্যাসের অন্বেষণের প্রতি, কারণ তখনও স্পষ্টভাবে কোনো মতবাদ এরা প্রচার করে নি; অথচ পরবর্তী যুগের উপনিষদে কখনো নূতন মতবাদ প্রকাশের তাগিদ পরিস্ফুট হয়েছে।

বিষয়বস্তু (আরণ্যক)

ঐতরেয় আরণ্যকের প্রথম ও শেষ অধ্যায়গুলিতে মহাব্রত অনুষ্ঠান আলোচিত হয়েছে, যা চরিত্রগতভাবে ব্রাহ্মণের সঙ্গে তুলনীয়। চতুর্থ অধ্যায়ে অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত নয়টি ঋক (শাকির ও মহানামী) বিবৃত হয়েছে; বিষয়বস্তুর বিচারে অন্তত এই অংশটি ব্রাহ্মণতুল্য। শুধু দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়কেই যথার্থ আরণ্যক লক্ষণযুক্ত বলে গ্রহণ করা যায়। গভীরতর বিচারে দেখা যায় যে, এই আরণ্যক বস্তুত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত উপবিভাগ বা কাণ্ডমাত্র। যথার্থ ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুযায়ী পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে তিনটিতে যজ্ঞানুষ্ঠান আলোচিত হয়েছে, নিতান্ত প্রসঙ্গক্রমে তাতে কাল্পনিক ব্যুৎপত্তি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। চিত্রকল্পগুলিতে ব্যবহৃত ব্যাকরণত অনুপুঙ্খাসমূহের সঙ্গে পরিচিতির ইঙ্গিত থাকায় ঐতরেয় আরণ্যকের অর্বাচীনতা স্পষ্ট।

ঋগ্বেদের অপর আরণ্যকের নাম শাখায়ন বা কৌষীতকি আরণ্যক, এর পনেরোটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম দুটিতে মহাব্রত অনুষ্ঠান বিবৃত হয়েছে এবং তা ব্রাহ্মণ অংশেরই অন্তর্গত। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য সম্পর্কে চিত্রগার্গ ও শ্বেতকেতুর মধ্যে সংলাপ। চতুর্থ অধ্যায়ে কৌষীতকি পৈঙ্গেয় ও শুষ্কতৃঙ্গারের মধ্যে একটি সংলাপে একটি সাধারণ বিষয়বস্তু–প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতিযোগিতা চিত্রিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে প্রতর্দন ও ইন্দ্রের সংলাপ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে গাগ্য ও অজাতশত্রুর সংলাপ। শেষ অধ্যায়ের একটি অংশে এই আরণ্যক স্পষ্টত নতুন সাহিত্যাদর্শের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। প্রতীকী বিশ্লেষণের প্রতি প্রবণতার মধ্যে। বিষয়বস্তুর মধ্যেও ঔপনিষদিক ভাবধারার উন্মেষের আভাস পাওয়া যায়; সপ্তম অধ্যায়ে বিবিধ বিবায়বস্তু, অষ্টম ও নবমে প্রাণের উপাসনা, দশমে আপ্তাত্মিক অগ্নিহোত্র এবং একাদশে প্রজাপতি কর্তৃক পুরুষের মধ্যে দেবতাদের প্রতিষ্ঠা বিবৃত হয়েছে। শেষোক্ত অধ্যায়ে সেই সঙ্গে স্বপ্ন ও অশুভ লক্ষণসমূহ আলোচিত হয়েছে বলে এর পৃথক গুরুত্ব রয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে আশীর্বাদ ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা পুরণের জন্য অনুষ্ঠান আলোচিত হয়েছে। ত্যাগের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ রয়েছে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। চতুর্দশ অধ্যায়ে বেদাধ্যয়নের মহিমা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে অবহেলাকারীর উদ্দেশে নিন্দাবাদও বধিত হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বহুপ্রজন্ম-ব্যাপী শিক্ষকদের নামের এক সুস্পষ্ট তালিকা আছে। বহু অংশেই আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণসমূহ এবং পরলোক ও প্রেততত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

প্রচলিত আরণ্যকগুলির মধ্যে তৃতীয় ও শেষ রচনা হল : তৈত্তিরীয় আরণ্যক; স্বভাববৈশিষ্ট্যই এটি ভিন্ন, কারণ এতে এমন কিছু উপাদান আছে যা এই শ্রেণীভুক্ত অন্য দুটি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। দশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত গ্রন্থটির অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নানাধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত করেছে। বিভিন্ন প্রকারের নামের দীর্ঘ তালিকা, প্রতিশব্দ, নৈসর্গিক বস্তুর শ্রেণীবিভাজন এবং স্বাস্থ্য, ধন, সন্তান, পরমায়ু, বিজয় ও স্বর্গলাভের জন্য সংহিতার দেবতাদের কাছে অসংখ্য সংহিতা-জাতীয় প্রার্থনা। এছাড়া এতে

ধর্মসূত্রের উপযোগী বিষয়বস্তুও খুঁজে পাওয়া যায়। এটা আরও স্পষ্ট, কারণ ইতোমধ্যে জাতিভেদ প্রথা স্বীকৃত সামাজিক সত্য হয়ে উঠেছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক তিনটি ভিন্ন বর্ণের জন্য এমন সব ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম গ্রথিত করেছে, যার মধ্যে ধর্মসূত্রের প্রত্যক্ষ পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বহু মোত্র এবং ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের কিছু কিছু সম্পূর্ণ সূক্ত খুঁজে পাওয়া যায়। এমন কি যজুর্বেদীয় ধারার জাদুবিদ্যা সূচক পুনরাবৃত্তিপূর্ণ বহু গীতিও এতে আছে।

আঙ্গিক (আরণ্যক)

প্রাচীন দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত সূক্তগুলি সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঙক্তিতে গ্রথিত, আহুতি গ্রহণের জন্য সেখানে দেবতাদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সর্বত্রই প্রকৃত যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষিত হয়েছে। অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর ইন্দ্রজাল এতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে; চতুর্থ অধ্যায়ের অধিকাংশ স্থানেই ভবিষ্যদবাণী, শুভাশুভ লক্ষণ গণনা, ব্যাধি ও স্বপ্ন আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া, লোকায়াত ধর্মের উপাদানলব্ধ অসুর এবং রাক্ষস-রাক্ষসী প্রাধান্য পেয়েছে।

যথার্থ আরণ্যক অংশগুলিতে ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠানসমূহ একধরনের ছদ্মযুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে ব্যাঘাত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের সূচনা ব্যাকরণ ও শিক্ষা আলোচনা দিয়ে, কিন্তু অল্প পরেই এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে যে, সংহিতার 'উপনিষদ' বাখ্যা করা হবে। এই কথাটি বিশেষ তাৎপর্যবহ, কারণ এখানে সর্বপ্রথম বলা হল যে, সংহিতাগুলির একটি গোপন তাৎপর্য (উপনিষদ) আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক অতীন্দ্রিয় রহস্যযুক্ত আধ্যাত্মিক বিবৃতিকে উপনিষদ নামে অভিহিত করেছে। সপ্তম অধ্যায় পাঁচটি বিভাগে বিন্যস্ত–প্রাকৃতিক, অতিজাগতিক, বিদ্যাচর্চা বিষয়ক, পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক; শেষোক্ত অধ্যায়ের লক্ষ্য হ'ল উন্নততর জ্ঞান অর্জন ও প্রজ্ঞার অনুশীলন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের কিছু কিছু শ্লোক কয়েকটি উপনিষদেও পাওয়া যায়; তবে, এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক ঋণ গ্রহণের সম্ভাবনার চেয়ে জনসমাজে দীর্ঘকালব্যাপী ভাসমান আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির সাহিত্যভাণ্ডার থেকে এদের উৎপত্তির সম্ভাবনাই প্রবলতর। ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত থেকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ইচ্ছামতো উদ্ধৃত করে। পরম্পরের সঙ্গে মিশ্রিত করার সময়ে কখনো কখনো সেগুলির ঈষৎ পরিবর্তনও করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে একটি কৌতুহলজনক ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন দেবতা নারায়ণের গৌরবায়নের অব্যবহিত পরে রুদ্রের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। ফলে, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, সংহিতার প্রাচীনতর দেবতারা এই পর্বে পৃথক

পৃথক ধর্মগোষ্ঠীগত ধর্মচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছেন। সমাজে অনিবার্যভাবে যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হচ্ছিল,-তা ধর্মতত্ত্বের স্তরে এবার প্রতিফলিত হ'ল।

আঙ্গিক ও ভাষাগত বিচারে ঐতরেয় আরণ্যক সম্পূর্ণতই ব্রাহ্মণচরিত্রযুক্ত, যদিও এর বহু আঙ্গিকগত দিক ঋগ্বেদীয় পর্যায় থেকে উদ্‌ভূত এবং স্পষ্টত এতে সেই সময়ের অভিব্যক্তি ঘটেছে। যখন যজ্ঞীয় ধর্ম পরিপূর্ণভাবে বিকশিত। রচনার সাধারণ কাঠামো হ'ল কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মন্ত্রসমূহের উদ্‌ধৃতি এবং পরে সেই অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা। উদীচ্য বা উত্তরাঞ্চলের উপভাষার তখনও প্রাধান্য আছে, 'র' ধবনির বিকল্পরূপে খুব কম ক্ষেত্রেই 'ল' ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তবে মধ্যদেশের উপভাষার প্রভাব বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষগোচর। তখনও উপসর্গ ক্রিয়াপদ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ঐতিহ্যনুযায়ী শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্তি তখন পর্যন্ত সাধারণভাবে প্রচলিত। কখনো কখনো কয়েকটা নূতন ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে।

শাঙ্খায়ন আরণ্যকের মধ্যে আমরা ব্যাকরণ-সচেতনতার প্রমাণ পাই, ঐতরেয় আরণ্যকের রচনা-শৈলীর মতো এই গ্রন্থের শৈলী ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বতোভাবে গতানুগতিক এবং একই কারণে এখানে সূত্রকারে দীর্ঘস্তবকের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে বহু শ্লোক গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু গদ্য সাধারণভাবে নিস্প্রাণ। পরবর্তীকালের অধিকাংশ ব্রাহ্মণের সমসাময়িক পাণিনির নিয়মাবলীর সঙ্গে এই আরণ্যকে প্রতিফলিত ব্যাকরণের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রধান ছন্দ হ'ল অনুষ্টুপ, এই তথ্য থেকে সম্ভবত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, আলোচ্য আরণ্যকের শ্লোকগুলি পরবর্তীযুগের মহাকাব্য এবং সমাজদেহে ভাসমান গীতিকাগুলির ভিত্তি রচনা করেছে। আলোচ্য আরণ্যকে কিছু কিছু কাব্যগুণান্বিত চিত্রকল্প পাওয়া যায়; মোটামুটিভাবে ভাষার প্রাচীনতার অনেক লক্ষণ থাকায় তার সঙ্গে অব্যবহিত উত্তরসূরীর উপনি স্থাদি অপেক্ষা সংহিতার সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্য পরিস্‌ফুট হয়েছে। ভাষা ব্যবহারের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে মধ্যদেশের উপভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। গায়ত্রী যে ইতোমধ্যে বিধিবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তা এর বহু বিকল্প প্রয়োগ থেকে সুস্পষ্ট।

আরণ্যকের সাহিত্যগত তাৎপর্য যদিও নিতান্ত ক্ষীণ, তবুও কখনো কখনো কাব্যিক সৌন্দর্য্যের আভাস পাওয়া যায়, যা অভিজ্ঞতার গভীরতা ও মহিমা এবং জীবন সম্পর্কিত অন্তদৃষ্টির উপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল; শুধু আলঙ্কারিক প্রয়োগ বা প্রকৃতি-বর্ণনাকে এতে পৃথক গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। তবে, অতি দীর্ঘায়িত সূত্র এবং ঐন্দ্রজালিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত শব্দা 'স্বরের পুনরাবৃত্তি অধিকস্থান অধিকার করার ফলে চিত্রকল্প ও প্রেরণালব্ধ রচনার মান রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বহু সীমাবদ্ধতার

মধ্যে দৈনন্দিন জীবন থেকে আহত উপমা কিংবা পর্যবেক্ষণলব্ধ বর্ণনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সমাজচিত্র (আরণ্যক)

আনুষ্ঠানিক বা আধ্যাত্মিক আলোচনা উত্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাখ্যান ও লোকশ্রুতি একত্র করে আমরা আরণ্যকের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। ঐতরেয় আরণ্যকে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্র যখন উপদেশের জন্য বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করেছিলেন, তখন ঋষি বলেছিলেন যে, অন্নই হ'ল শ্রেষ্ঠ। তত্ত্ব [২ : ২ : ৪] শাখায়নেও এই ধারণার পিনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় [৮ : ২ : ১, ৯ : ৭ : ১, ৯ : ৯ : ১]।

অনুরূপভাবে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে যে, ভৃগু যখন তাঁর পিতা বরুণের নিকট উপদেশ চেয়েছিলেন, বরুণ তখন তাঁকে অন্ন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন (৯ : ১১)। এভাবে বিভিন্ন আরণ্যকের বিচ্ছিন্ন কিছু উপাখ্যান থেকে আমরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই।

ইতোমধ্যে সন্ন্যাস যে মহান ও গৌরবজনক একটি আধ্যাত্মিক চর্চার উপায় ও ধর্মস্পদরূপে স্বীকৃত, আরণ্যকে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতরেয়তে ভরদ্বাজকে সর্বাধিক বিদ্বান, সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী এবং ঋষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে (১ : ২ : ২ : ৪)। আরণ্যকে জাতিভেদ প্রথা সামাজিক বাস্তবরোপে প্রতিষ্ঠিত; বহুস্থানে আমরা বিভিন্ন বর্ণের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তির্যক কিছু উল্লেখ দেখতে পাই। পারস্পরিক অভিবাদনের রীতি সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, পরবর্তী ধর্মসূত্রের সঙ্গে তাদের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও যে শ্রেণীভেদ ছিল, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত চোখে পড়ে। অরণ্য-মধ্যবতী আশ্রম নিবাসী শিক্ষকদের সঙ্গে রাজ-পুরোহিতদের যে বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছিল তাও এতে বেশ স্পষ্ট। বিদ্যাদাতা ব্রাহ্মণরা অরণ্যবাসী হওয়ার ফলে সাধারণভাবে ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু অন্য একটি কারণে তারা ছিলেন অধিকতর সম্মানিত; কারণ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে তারা পুত্র বা শিষ্য ব্যতীত অন্য কাউকে শিক্ষা দিতেন না, বিশেষত অন্যজমান ব্যক্তিকে কখনোই ব্রহ্মবিদ্যা দান করা যেত না। অতএব, গুরুপরম্পরা বা প্রজন্মক্রমে এইসব গূঢ়তত্ত্বের আচার্যরা সমাজমানসে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু প্রাচীনতর শাস্ত্রবিশেষজ্ঞদের বক্তব্য উদ্‌ধৃত হওয়ায় দীর্ঘ ধর্মতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের জটিলতা ও পরিণতিই প্রমাণিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে [১ : ১১ : ৮] বলা হয়েছে যে, জ্ঞানই মানবজাতির পক্ষে সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় বস্তু; জ্ঞানী ব্যক্তিরাই প্রকৃত সজ্জন। নর-নারীর পারস্পরিক সান্নিধ্যের সম্বন্ধে কতকটা উদার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে : বিবাহিত ও অবিবাহিত-এই উভয়বিধ নারীর গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে।

এই পর্যায়ে জাতীয় সম্পদ মূলত কৃষিকার্য থেকে উদ্‌ভূত হ'ত; ভারবাহী পশু, কৃষক, লাঙল, চাবুক ও চামড়ার পাতলা ফালির স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়াও পৃথিবীর উদ্দেশ্য উচ্চারিত একটি দীর্ঘ সূক্তে প্রচুরতর শস্যের আকাঙ্খায় রচিত প্রার্থনার মধ্যে কৃষিকার্যের সীতা শুন্যাসীরের উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, পর্যাপ্ত শস্য-উৎপাদক পৃথিবীকে এই পর্যায়ে নিম্নোক্ত বিশেষণসমূহে ভূষিত করা হয়েছে : বসুন্ধরা, ধরণী, লোকধারিণী, গন্ধদ্বারা, দুরাধর্ষা, নিত্যপুষ্টা ও করীষিণী শাঙ্খায়ন আরণ্যক, [১০ : ১]। এসব বিশেষণ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তখনকার জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা প্রাথমিকভাবে কৃষিনির্ভর ছিল। তবে খাদ্যের জোগান পর্যাপ্ত বা নিয়মিত ছিল না; দারিদ্র্যের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়,–দারিদ্রের গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার আশাই বহু প্রার্থনার মর্মবস্তু। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তখনো প্রবল শত্‌রুরূপে গণ্য (অশনায়া ও পিপাসা অর্থাৎ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা); প্রজাপতি সৃষ্টি করার পরে তারা মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট হয়েছিল। সংহিতার মতো আরণ্যকেও হতস্বাস্থ্যের উদ্ধার, কার্যশক্তির বৃদ্ধি, চমৎকারিত্ব এবং উত্তম সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা সাধারণভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অত্যন্ত কঠোর রীতিতে বিধিবদ্ধভাবে বিশেষ ধরনের কুবের-পূজার বিধান দেওয়া হয়েছে; দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বাহারাকে এই পূজা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য প্রেরণাও দেওয়া হয়েছে। পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম 'নৃযজ্ঞ' ইতোমধ্যে কেবল ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে অন্নদানের সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বেদাধ্যয়ন অরণ্যে থেকেই অভ্যাস করতে হবে, এমন কথাও পড়ি। দুর্বল ও অশক্ত ব্যক্তিদের জন্য নানাবিধ বিকল্প যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান দেওয়া হয়েছে। এটা এমন একটা সময় যখন প্রাচীন ধর্ম নানা রকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নুতন একটি রাপে পরিগ্রহ করেছিল। উপাসনা পদ্ধতিরূপে পূজার প্রবর্তন, গুরুত্বপূর্ণ নূতন দেবতারূপে কুবেরের আবির্ভাব ইত্যাদি ছাড়াও ভাবী অমঙ্গলের লক্ষণ, স্বপ্ন, কবচ ও কবচ নির্মাণ ও পরিধানের ঐন্দ্রজালিক আচার সাহিত্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এ সময় ভৌগোলিক পরিসর আরও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্‌তৃত হয়েছে, কারণ গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবতী অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণই অপেক্ষাকৃত শ্রদ্ধেয়রূপে পরিগণিত। আমরা কুরু পাঞ্চাল, উশীনর, মৎস্য, কাশী ও বিদেহের কথা শুনতে পাই, যে সব অঞ্চল পরবর্তীকালে 'মধ্যদেশ' নামে পরিচিত হয়েছিল। সামাজিক জীবন সম্পর্কে সাধারণ চিত্রটি হ'ল তুলনামূলকভাবে শান্তিবৃদ্ধি ও সাংস্কৃতির। তৈত্তিরীয়ে বীণা সম্পর্কিত (দৈব

ও মানবিক—এই উভয়বিধ) একটি দীর্ঘ আলোচনা (২ : ৩ : ১) থেকে অনুমান করা যায় যে, সে সময় ললিতকলার, বিশেষত সঙ্গীতের চর্চা প্রচলিত ছিল।

আরণ্যকে প্রতিফলিত নীতিচিন্তা মুখ্যত সত্য ও অসত্য সম্পর্কে কাব্যিক অভিব্যক্তির মধ্যে আভাসিত হয়েছে। নারী-সমাজের শুচিতার সঙ্গে সতীত্বের ধারণা তখন থেকেই সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে পাপ সম্পর্কে নূতন চিন্তার সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়, বিশেষত কুসীদ প্রত্যপণে ব্যর্থতার জন্য ক্ষয়-রোগ ও মৃত্যুদণ্ড নিরূপিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ঋণপরিশোধ ও শান্তি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে ধর্মবোধ ও মুক্তির নতুন চিন্তাও আভাসিত (২ : ৬) তবে, কৃষিজীবী সমাজের কাছে পাপ-পূণ্য যে সব সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী নিরূপিত হচ্ছে, তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। একই কারণে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিও তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। নতুন একটি সাহিত্য শ্রেণীরূপে আরণ্যকের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এই যে, সর্বপ্রথম যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি এতে অতিপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। দেবকাহিনী অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা সম্পর্কিত পূর্ববতী চিন্তাভাবনা পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে এখন যেন অপর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। আরণ্যকে পূর্ববতী ধর্মচর্চার পুনবিশ্লেষণের পশ্চাতে যে যুক্তিবোধ ক্রিয়াশীল তা মূলত অতীন্দ্রিয় রহস্যজাত। ব্রাহ্মণ পর্যায়ের যজ্ঞ বিশ্লেষণে এর প্রাথমিক বীজ অঙ্কুরিত হলেও এ ক্ষেত্রে তা নিশ্চিতভাবে ভিন্ন দ্যোতনাযুক্ত।

আরণ্যকে ঐতিহ্যগত বিষয়বস্তুর প্রতীকী পুনর্বিশ্লেষণের মধ্যে উপনিষদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। স্বাধ্যায়ের উপর আরোপিত বিশেষ শুরুত্ব, তার গৌরবায়ণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে অন্যধ্যায় সম্পর্কিত নতুন নিয়মাবলী সম্পূর্ণত নতুন দৃষ্টিভঙ্গির-ই পরিচয় বহন করছে। আরণ্যক পর্যায়ে স্বাধ্যায় যেন বিশেষ এক ঐন্দ্রজালিক পবিত্রতা অর্জন করেছে। স্পষ্টত স্বাধ্যায়ের মূল অর্থ ছিল দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের দ্বারা ঋগ্বেদ সংহিতার আবৃত্তি; পরবর্তী পর্যায়ে এর অর্থ দাঁড়াল ঋগ্বেদের অংশ বিশেষ এবং আরো পরবর্তী কালে শুধু গায়ত্রীমন্ত্র আবৃত্তি করা। কালক্রমে তাই আরণ্যকের নির্দেশক বক্তব্যে পরিণত হ'ল। ঐতরেয় আরণ্যকের একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের (৫ : ৩ : ২) তাৎপর্য একাধিক স্তরে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, স্বাধ্যায় একসময় বহু ব্যক্তিদ্বারা অবহেলিত হয়েছিল বলে এখানে তার সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের চেষ্টা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্বাধ্যায়ের অনুশীলন থেকে আত্মজ্ঞান ও সত্যবোধ অর্জিত হয়; এর দ্বারা বুঝি যে জ্ঞান তৎকালীন সমাজে আকাঙিক্ষত আধ্যাত্মিক মূল্য পেয়ে গেছে। তৃতীয়ত, এই বক্তব্য মহাব্রত অনুষ্ঠান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর উপসংহারে রয়েছে যে, অনুষ্ঠান নাকি স্বাধ্যায় ব্যতীত অসম্পূর্ণ–আনুষ্ঠানিক প্রসঙ্গে এধরনের বিবৃতি কতকটা অপ্রত্যাশিত।

বর্ষকালব্যাপী গবাময়ন যজ্ঞের অন্তর্গত একদিবসীয় মহাব্রত অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে ঋগ্বেদের ঐতরেয় ও শাঙ্খায়ন আরণ্যকে পুনর্বিশ্লেষিত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, অর্বাচীন যজ্ঞগুলির অন্যতম গবাময়নকে বৈদিক ধর্মের কর্মমূলক ও জ্ঞানমূলক স্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখা যায়, জ্ঞানতৃষ্ণা অন্ততপক্ষে ব্রাহ্মণ যুগের সমকালীন। তবে, আরণ্যক পর্যায়ে মৌলিক গুরুত্ব অর্জন করবার পূর্বে তা গবাময়নকে, বিশেষত এর অন্তর্গত মহাব্রত অনুষ্ঠানকে যজ্ঞানুষ্ঠান ও জ্ঞানচর্চার সেতুরূপে গ্রহণ করেছে, এই প্রক্রিয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং তৎকালে উদীয়মান আধ্যাত্মিক প্রবণতার উপযোগী একটি বিশেষ ও অপেক্ষাকৃত নুতন অনুষ্ঠানকে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনর্বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এ ধরনের পুনর্বিশ্লেষণ যুক্তিনিষ্ঠ না হয়ে অতীন্দ্রিয় দ্যোতনাযুক্ত হয়েছে; বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যেরই প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী। ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের বহুস্থানে এর নিদর্শন রয়েছে। বৈদিক যজ্ঞের প্রতীকায়ণ ও মানস যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবৃতিতে কিছু কিছু বেদোত্তর লোকায়ত ধর্মচর্চার মৌলিক অভিব্যক্তির চিহ্ন খুজে পাওয়া যায়। প্রত্ন-অধ্যাত্মভাবনার পাশাপাশি আমরা অকৃত্রিম জাদুচর্চার প্রবণতারও আভাস পাই।। জীবনের সম্বন্ধে ঐন্দ্রজালিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ নিরবছিন্ন প্রকাশরূপে দেহ, মন ও আত্মার অতীন্দ্রিয় বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতাই আরো পরবর্তীকালে তন্ত্রসাহিত্যে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল।

দেবসঙ্ঘ (আরণ্যক)

মহিমার কিয়দংশ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ব্রাহ্মণ যুগে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়ে, সেই যুগেই তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলেও, আরণ্যকে তার ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া অব্যাহত। ঐতরেয় আরণ্যকে (২ : ১ : ৮) বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে মানুষের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রীর উপরই দেবতারা নির্ভরশীল। এই পর্যায়ে দুটি স্পষ্ট প্রবণতা লক্ষণীয়; প্রথমত, লোকায়ত অনৈষ্ঠিক দেবতাদের প্রবর্তন এবং দ্বিতীয়ত, সমস্ত দেবতার এমন এক সর্বোত্তম দেবতার মধ্যে আশ্রয়লাভ, যিনি সমস্ত প্রাচীন দেবসঙ্ঘের সম্পূরক হয়ে উঠেছেন। কুবের বৈশ্রবণ এখন হাে্মের পরিবর্তে বলিভুক। এই নির্দেশের পরবর্তী স্তোত্রে ধর্ম সম্পর্কে পুরাণ-কথিত উপাসনাপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আভাসিত হয়েছে। রতি বিশ্বাবসু, দন্তী, গরুড়, দুগী, তৎপুরুষ, কন্যাকুমারী, নারায়ণ ও বাসুদেবের উদ্ভব ঘটেছে। একই স্তবকে অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল ও দুর্গতিতারিণী দুর্গাদেবীকে আহ্বান করা হয়েছে। নারায়ণের উদ্দেশে নিবেদিত সূক্তটিতেও দেখি নুতন বৈশিষ্ট্য; সমুদ্রনিবাসীরূপে তিনি এখানে বর্ণিত। বস্তুত, এখানেই মহাকাব্য ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের অন্যতম কেন্দ্রীয় দেবতা নারায়ণের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

অম্বিকার পতিরূপ রুদ্র আহূত হয়েছে–শুক্ল যজুর্বেদে (১৬শ) তিনি অম্বিকার ভ্রাতা ও উমার স্বামী; স্বয়ং উমাকে পাওয়া গেছে কেনোপণিষদে। অদিতির উদেশে নিবেদিত একটি আগ্রহহা েদীপক সূক্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ-সেখানে তাকে সকল প্রাণী, পৃথিবী এবং পরমপুরুষের মাতাররূপে সম্বোধন করা হয়েছে, আমাদের কাছে সেই পরমা মাতৃকাদেবীর উত্থান। এখানে আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, পৃথিবী যাঁর ভিত্তিভূমি; কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর পক্ষে তা-ই স্বাভাবিক–অথচ ইনি অন্যান্য মাতৃকাদেবীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও আত্মস্থ করে নিয়েছেন। এই সঙ্গে আমরা যখন মনে রাখি যে, সংহিতা-ব্রাহ্মণ যুগের দেবসঙেঘ্য পুরুষদেবতাদের প্রাধান্য ছিল তর্কাতীত, তখন প্রাগুক্ত পরম মাতৃকার উত্থান অধিকতর তাৎপর্যাবহ হয়ে ওঠে; কারণ এই দেবী এখন আর অন্য কোনো পুরুষ দেবতার সঙ্গিনী নন, আপন অধিকারেই তিনি বিশিষ্টা মাতৃকা।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রজাপতির উত্থানের মধ্য দিয়ে একেশ্বরবাদী প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু আরণ্যক পর্যায়ে আরো বহু নূতন উপাদান যুক্ত হওয়ায় এই প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠল, যে সমস্ত প্রাচীনতর রচনায় পুরুষ, অক্ষর, ওম, ব্রহ্মা ইত্যাদি মহিমান্বিত হয়েছিলেন সেসব ক্ষেত্রে এদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় অস্তিত্ব ছিল স্বীকৃত; কিন্তু এই পর্যায়ে তাদের একীভূত করে তোলার সচেতন প্রয়াস দেখা গেল। পরম দেবতার নাম যদিও তখনো পর্যন্ত অনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনশীল, 'সমস্ত দেবতাই পুরুষে প্রতিষ্ঠিত' (শাঙ্খায়ন ১০ : ১) তবুও এমন বিবৃতি সাধারণভাবে লভ্য এবং তাতে ক্রমবর্ধমান একেশ্বরবাদী প্রবণতারই পরিচয় স্পষ্ট।

জ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্ব

আরণ্যক ও উপনিষদকে যে জ্ঞানকাণ্ড বলে অভিহিত করা হয়, তা যুক্তিযুক্ত; কারণ, ইতোপূর্বে জ্ঞানের প্রতি কখনো এত শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয় নি। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে জ্ঞান অর্জনের পুরস্কার সর্বতোভাবে ছিল পার্থিব–কেননা পার্থিব আনন্দের চিরায়িত, মহিমান্বিত, পরিবর্তিত প্রকাশই স্বর্গকল্পনার ভিত্তি; কিন্তু আরণ্যক পর্বে এর তাৎপর্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের লক্ষ্য ছিল, যজ্ঞানুষ্ঠানের নিগূঢ় রহস্যবাদী দুর্জেয় ব্যাখ্যা বা স্তোত্রসমূহের অতীন্দ্রিয় তাৎপর্যনির্ণয়, কিন্তু আরণ্যকের উৎসাহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নির্যাস ও মানবজীবনের আধ্যাত্মিক ও উদ্ভবত্ত্বমূলক তাৎপর্য আবিষ্কারে। এই যুগে অন্য যে নুতন দিকে আগ্রহ দেখা গেল, তা হ'ল জ্ঞানতত্ত্ব। সময় জ্ঞানের নুতন নুতন ক্ষেত্র উন্মোচিত ও প্রসারিত হচ্ছিল-জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত প্রাথমিক অনুমান-নির্ভর আলোচনা, ধাতুবিদ্যা ও স্বভাবত প্রাথমিক পর্যায়ের রসায়ণবিদ্যা, কিছু কিছু ভূতত্ত্ব, অস্থিসংস্থান বিদ্যা, শরীরবিদ্যা, মনস্তত্ব, ভাষাতাত্ত্বিক

দর্শন (ব্যাকরণ ও নিরুক্তি), অধিকতর সুবিন্যস্ত ধর্মতত্ত্ব ও অনুষ্ঠান-বিদ্যা, সঙ্গীত এবং অন্যবিধ শিল্পকলা। সুতরাং জ্ঞানচর্চার মূল্য এযুগে সাধারণভাবে উন্নতমানের স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

আরণ্যকের বহুস্থানে জ্ঞানের জন্য নবজাগ্রত তৃষ্ণা অভিব্যক্ত হয়েছে। এমন কিছু জ্ঞানের জন্য আগ্রহ তখন দেখা গেছে যেগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান বা ঔপনিষদীয় অধ্যাত্মবিদ্যার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন, প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের উপায় কিংবা প্রকৃতি ও জীবনের মর্মগত বাস্তবতার সন্ধান। আবার যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রাচীন জ্ঞান যেহেতু এযুগে অপর্যাপ্ত ও অতৃপ্তিকর বলে বিবেচিত হল, পরম সত্য অনুভবের আকাঙ্ক্ষা তাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে গেল-বস্তুজীবন থেকে অধ্যাত্মজীবনের তাৎপর্য সন্ধানের উত্তরণ প্রবলতর হল। ইন্দ্র, সরস্বতী ও অশ্মীদের উদ্দেশে মেধার জন্য প্রার্থনা আরণ্যকের এক নূতন বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে, সে যুগে পুরোহিতদের বর্ধিতভাবে বুদ্ধি-আয়ত্ত সূক্ত অনুষ্ঠানবিদ্যা মুখস্থ করার কৌশল এবং উপলব্ধি বর্জিত জ্ঞানের অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসতা ।

সৃষ্টিতত্ত্ব ও হেতুসন্ধান সম্পর্কিত জ্ঞানের জন্য যে অন্বেষণ শুরু হয়েছিল, আরণ্যকে তা অব্যাহত থাকে। তবে, বিভিন্ন প্রত্নকথায় বিশ্বস্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনি সেগুলির উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি কোথাও এক নয়। কোথাও বলা হয়েছে, আত্মার আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছিল, কোথাও বা প্রজাতির সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা, তার তপস্যা ও তৎপ্রসূত সৃষ্টি পরম্পরা বর্ণিত হয়েছে। কোথাও সৃষ্টির অব্যবহিত পরে প্রজাপতির ক্লান্তি ও ছন্দের সাহায্যে বর্ষাকাল পরে তীর পুনরুজ্জীবন বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, অসৎ বা নাস্তি থেকে সৃষ্টির উদ্ভব ঘটেছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সৃষ্টি যেখানে যজ্ঞসভূত, আরণ্যকে এই প্রথম সর্বতোভাবে নুতন সৃজনশীল উপাদানরূপে কামনা জ্ঞান ও তপস'-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হল। তপসী যজ্ঞের সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ তার দ্বারা যজ্ঞের মৌল বস্তুটি অর্থাৎ কর্ম প্রত্যাখ্যাত হয়; তীব্র ধ্যানের উপর আরণ্যকের নুতন তত্ত্বটি লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত করেছে। দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল, স্রষ্টার সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষাই এখন সৃজন-প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

শরীরবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত হওয়ায় মানুষ যেহেতু মৃত্যুর কারণ ও মরণোত্তর অবস্থান সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল, তাই এই যুগের চিন্তায় প্রাণবায়ু বিশেষ প্রাধান্য রয়েছে। একটি জনপ্রিয় দেবকাহিনীতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ-সময় থেকে প্রাণের নূতন নূতন বিশেষণ আবিষ্কৃত হতে থাকে, যা পরম দেবতার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যুক্তিযুক্তভাবে পরবর্তী স্তরে প্রাণই স্রষ্টার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'ল (ঐতরেয় আরণ্যক ২ : ১ : ৭)। আরণ্যকের অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই প্রাণ, যজ্ঞানুষ্ঠান ও অধ্যাত্মভাবনার

মধ্যবতী যোগসূত্ররূপে প্রতীকে মূল্য অর্জন করেছিল। কৌষীতকি ও পৈঙ্গ্য অনুযায়ী প্রাণ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মীভূত।

বিমূর্তায়নের ক্রমবর্ধমান যে প্রবণতা বৈদিক যুগের শেষ পর্বে সুরু হয়েছিল, তা আরণ্যকে অধিকতর পরিস্ফুট। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে 'শ্রদ্ধা ও কাল'-এর মতো বিমূর্ত ধারণার উদ্ভব; তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সূচনায় 'কাল' সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। সেখানে অত্যন্ত প্রবল অধ্যাত্মবাদী ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবিভাজ্য মহাকালকে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ সময় থেকে পৃথকরূপে দেখা হয়েছে ও সমুদ্র ও নদীর তুলনা করা হয়েছে। মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অনুরূপ পার্থক্য প্রদর্শন প্রসঙ্গে দেহ ও মনের দ্বৈততা আলোচিত হয়েছে। দেহের নশ্বরতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অমরতার দ্যোতনাও এখানে পাওয়া যায়। শাখায়ন আরণ্যক প্রাচীনতর। ঐতিহ্যের উল্লেখ করে অতিজাগতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উপাদানসমূহের মধ্যে প্রায়-যৌন সম্পর্কের অবস্থা কল্পনা করেছে। সমস্ত কিছুর মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তৃষ্ণা অভিব্যক্ত। তবে, নুতন প্রবণতার মধ্যে দেহ ও আত্মার দ্বৈতবোধ সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ত উপস্থিত; দৈহিক ক্রিয়া ও তথ্যকে সতর্কভাবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তর থেকে পৃথক করে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই নবজাগ্রত অধ্যাত্মবাদী চিন্তা কখনো কখনো তৎকালীন লোকায়ত কুসংস্কারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তাই, আন্তরিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পর্যবেক্ষণ শুরু করেও বহু জ্ঞানান্বেষণ প্রক্রিয়া নানাবিধ সংস্কারের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মননের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি পাশাপাশি রয়েছে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসে প্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি।

বৈদিকযুগের শেষ পর্বের সূচনায় চিন্তাশীল ও ধর্মতত্ত্ববিদরা মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে ওঠেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে [১ : ৮ : ৪; ৫] চার ধরনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে; স্বাভাবিক, সোম, অগ্নি ও চন্দ্র। একই গ্রন্থে চার ধরনের নরকও বর্ণিত [১ : ১৯ : ১] : বিসর্পী, অবিসর্পী, বিষাদী ও অবিষাদী। এরই বিপরীত মেরুতে রয়েছে স্বর্গকল্পনা [২ : ৬ : ১]; প্রাচীন মানুষের ভাবনায় ব্যাধি থেকে মুক্ত এবং অতীত ও আগামী প্রজন্মগুলি দ্বারা ভোগ্য এমন একটি কল্প রাজ্য বর্ণিত হয়েছে, যা সুকর্মের দ্বারা অর্জন করা যায়। আবার শাখায়ন আরণ্যকে [৩ : ১ : ৭] সদ্য স্বর্গে উপনীত আত্মার বর্ণনায় ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার একাত্মীভবন বিষয়ে উপনিষদের প্রধান ভাবনার অন্যতম প্রাচীনতর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। প্রজ্ঞানের মাধ্যমে স্বর্গলাভ করা যায়–এরকম নূতন চিন্তাধারার উন্মেষও আরণ্যকে ঘটেছে। লক্ষণীয় যে, কর্মের পরিবর্তে এখানে জ্ঞানের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও অমরতা লাভের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, সংহিতা ব্রাহ্মণের যুগে শুনি যে, শুধু জ্যোতিষ্টোমের মতো নির্দিষ্ট কিছু যজ্ঞ করার মধ্যে দিয়ে স্বর্গলাভ করা যায়। আরণ্যক ও উপষিদের যুগে জ্ঞানের দ্বারা পুনর্জন্মধারা থেমে মুক্তিলাভের কথা বিবৃত হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, আরণ্যক যুগ-সন্ধিক্ষণের সাহিত্য যখন

প্রাচীনতর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নূতনতর ভাবনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংমিশ্রিত হচ্ছিল। স্বর্গলাভের তপস্যার ভূমিকা যেমন স্বীকৃত তেমনি 'বৈরাগ্য'-ও দেহশুদ্ধি ও মৃত্যুজয়ের উপায় রূপে বর্ণিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক দেবযান ও পিতৃষাণের কথা বলেছে; আত্মা প্রথম মার্গ দিয়ে যাত্রা করে ও দ্বিতীয় মার্গ দিয়ে পুনর্জন্মে উপনীত হয়। পরবর্তী সাহিত্যে যে পুনর্জন্ম অবিমিশ্র অমঙ্গলের প্রকাশ, আরণ্যকে তাকে সাধারণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হলেও এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বক্তব্য এখনো রূপ নেয়নি। তেমনি মুক্তি সম্পর্কিত ভাবনাও অস্পষ্ট অবস্থায় ছিল; কখনো মুক্তি মৃত্যুজয়ের সমার্থক, কখনো বা এর তাৎপর্য হ'ল দেব-সান্নিধ্য।

জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে ও আনন্দময় চূড়ান্ত অবস্থানে উপনীত হওয়ার নির্ভরযোগ্য পথের বিষয়ে আরণ্যক শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিত রয়ে গেছে বলেই মুক্তি সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু পরস্পরবিরোধী বক্তব্য উপস্থাপিত করেছে। 'ব্রহ্ম' শব্দের পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গগত প্রয়োগের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভেদরেখাও দেখা যায় না। তবে পুংলিঙ্গগত ব্রিহ্মের অবশিষ্ট দেবকাহিনী ও নবরাপগত বৈশিষ্ট্য ক্রমশ লুপ্ত হওয়ায় তাকে অধিকতর ছায়াবৃত মূর্তিতে শুধু আধ্যাত্মিক সত্তাতেই দেখা যায়। ইন্দ্রজাল বা অলৌকিক ক্ষমতাযুক্ত শব্দ অর্থে 'ব্রহ্ম'-এর পুরাতন প্রয়োগ যদিও অক্ষুন্ন ছিল, তবুও তাৎপর্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের লক্ষণও কতকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেহেতু ধর্মতত্ত্ববিষয়ক আলোচনার অন্তর্বস্তুরূপেই এই শব্দটি আরণ্যকে ব্যবহৃত নিয়েছে। ব্রহ্মবাদী শব্দে ব্রহ্মের মৌল তাৎপর্য অর্থাৎ অনুপ্রাণিত বাক নিহিত রয়েছে; বৈদিক সমাজের আধ্যাত্মিক সম্পদের অভিভাবকরূপে পরিচিত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীরই শুধু ব্রহ্মবাদীর বিরল সম্মান লাভ করার অধিকার ছিল। যজ্ঞের প্রতীকী বিশ্লেষণ করা ছিল তাদের দায়িত্ব। আরণ্যকে ব্রহ্মবাদীরা যজ্ঞের নিয়মাবলী প্রণয়ন করতেন; অনুষ্ঠানসম্পর্কিত সমস্যা ও সংশয় নিরসনের বিশেষজ্ঞরূপে তারা উদ্‌ধৃত হতেন।

তবু, অন্তত দেবকাহিনীর দৃষ্টিকোণ থেকে, ব্রহ্মের প্রকৃতরাপ অস্পষ্টই থেকে গিয়েছিল। ব্রহ্মাকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপে অভিহিত করা হয়েছে; তার অনির্দেশ্য বিমূর্ত সত্তার বৈশিষ্ট্য সন্ধানের প্রবণতা ক্রমাগত প্রবল হয়ে উঠেছে। সমস্ত সমুন্নত দেবকাহিনী ও অধ্যাত্মবাদ-সঞ্জাত ধ্যানধারণা ক্রমশ ব্রহ্মের একক অস্তিত্বে এসে আশ্রয় পেয়েছে।

অন্যদিক থেকে এ সময় আত্মার দার্শনিক ভাবমূর্তি নির্মাণের প্রয়াসও শুরু হয়েছে; যা পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ উপনিষদে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অবশ্য উপনিষদের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে জীবনের মর্মসন্ধানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যে আরণ্যকে প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে কোনো সংশয় নেই। তখন পুরাতন মূল্যবোধ সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় তা অপর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হচ্ছিল; ফলে, জীবনের পুনর্মূল্যায়নের প্রেরণা অনিবার্য হয়ে উঠলো। প্রথম স্তরে প্রশ্নগুলি ছিল

মূলত প্রকৃতি, কাল ও বিশ্বজগতের সমর্থন সম্পর্কিত; ঐ সময় আর্যদের মধ্যে মৃৎকুটির নির্মাণের প্রাথমিক জ্ঞান পরিণততর হওয়ায় পরবর্তী পর্যায়ে দগ্ধ ইষ্টক (বা পকেষ্টক) নির্মিত জটিলতর গৃহনির্মাণ পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও স্থাপত্য-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুপুঙ্খ সম্পর্কে আগ্রহ। এ যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরের প্রশ্নগুলো ছিল মূলত নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং প্রেততত্ত্ব বিষয়ক। অনেক ক্ষেত্রে অভিব্যক্তিতে স্পষ্টতার ও সামঞ্জস্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়; বহু বিবৃতি ও সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী। সম্ভবত তৎকালে প্রচলিত লোকায়ত আরণ্যক সংস্কৃতির রহস্যবাদী প্রবণতার প্রভাবেই জ্ঞানচর্চা সর্বসাধারণের পক্ষে প্রতিবিদ্ধ হতে শুরু করে।

যুগসন্ধিক্ষণের সাহিত্য বলেই আরণ্যকের তাৎপর্য সম্পূর্ণ পৃথক, যদিও আয়তনের দিক থেকে বৈদিক সাহিত্যে এটি ক্ষুদ্রতম। ব্রাহ্মণে যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির প্রতীকী ব্যাখ্যা ছিল; কিন্তু পরবর্তী আরণ্যক সাহিত্যেই প্রথম যজ্ঞাপরায়ণ-জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত আদর্শ থেকে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হ'ল। যজ্ঞানুষ্ঠানের সীমাবদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করে অতিপ্রাকৃত বা অধ্যাত্মবাদী প্রতীকায়ণের প্রতি রচয়িতারদের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিবন্ধ হতে শুরু করল। তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে আরণ্যকে একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ; কারণ পাঁচ শতাব্দীরও বেশি সময় ধীরে জনগোষ্ঠীর শ্রদ্ধা ও সমর্থনধন্য দেবকাহিনী ও অনুষ্ঠানমূলক ধর্মবোধের বৃত্ত-বহির্ভূত ক্ষেত্রে তার বিচরণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। লঘু ঐতিহ্য ও লোকায়াত ধর্মের বিভিন্ন উপাদানের নিঃসংকোচে আত্মস্থ করে আরণ্যক শুধু বিশিষ্টই হয়ে ওঠেনি, পরবর্তী স্তরের বহুবিধ প্রবণতার প্রাথমিক উন্মেষের ক্ষেত্রও প্রস্তুত করেছে।